মুদ্রাস্ফিতি কোথায় ও কেন?

ড. এ.কে. এনামুল হক

দেশে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি অস্বাভাবিক। তার উপর হয়েছে বন্যা। তাই সাধারণ মানুষ যে চোখে সরষের ফুল দেখছে তা বলা বাহুল্য। এই পরিস্থিতিতে সরকার রয়েছে চাপের মুখে। এরপরও সমস্যা রয়েছে – আসছে রমজান মাস। দ্রব্য মূল্য আবারও বাড়বে। এই সময় দ্রব্য মূল্য নিয়ে রয়েছে নানা কথা রয়েছে নানা তত্ব। এর আগে আমি আমার গত ২ জুলাই ২০০৭ তারিখের লেখায় দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সিন্ডিকেট তত্বের সম্পর্ক ও তার অসাড়তা নিয়ে লিখেছিলাম। কিন্তু কাজ হয়নি। আমাদের সাধারণ মানুষের বুদ্ধির সাথে পারা যায় না। তারা খুব তাড়াতাড়িই সকল তত্ব বুঝে ফেলেন। অধিকাংশ 'বুদ্ধিজীবী' বা টকশো জীবীরাও মোটামুটি ভাবে বলেই ফেলেছেন যে, দ্রব্যমূল্য বাড়ার মূল কারণ – ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট। ফলে বিপদ আরও বেড়েছে। সরকারও থাকে চাপের মুখে তাই সকলের সাথে সুর মিলিয়ে দিব্যি সিন্ডিকেট খুজতে ব্যস্ত। লাগিয়েছে র‍্যাব, পুলিশ সহ জানা অজানা সকল বাহিনীকে। এ যেন রোগ না জেনে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। তাতে রোগ কমছে না বরং সকলে ডাক্তারের উপর বিরক্ত হচ্ছেন।

দেশের অর্থনীতি একটি অত্যন্ত জটিল পাটিগনিত। তাই অতি সহজে জট খুলতে চাওয়াটা সাধারণ মানুষের কাম্য হলেও তা সহসা যে ঘটছে না তা এখন বোধ করি সকলেই বুঝতে পারছেন। আমার আজকের এই লেখার বিষয় তাই মুদ্রাস্ফিতি। মুদ্রাস্ফিতি বলতে আমরা বুঝাই সাধারণভাবে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাওয়া। আমাদের এখনকার মুদ্রাস্ফিতির পরিমাণ ৯ শতাংশের উপর। অর্থাৎ হিসেবে ভুল না করে থাকলে গত বছরের এই সময়ের চেয়ে এই বছর জিনিষ পত্রের দাম বেড়েছে গড়ে ৯ শতাংশ হারে। এই জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে – আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আবার রয়েছে যাবতীয় অন্যান্য খরচ। আমাদের দেশে একজন ক্রেতা গড়ে প্রায় ৪০০ টি পণ্য ভোগ করে থাকেন। তাই মুদ্রাস্ফিতি বলতে এই ৪০০ পণ্যের গড় দাম বাড়ানোকে বুঝানো হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই সবাই যে ৪০০টি পণ্য ভোগ করেন তা নয় তাই মুদ্রাস্ফিতির প্রকোপ সকলের উপর সমান নয়।

কেন এই মুদ্রাস্ফিতি? এই বিষয়ে অর্থনীতিতে কোন স্পষ্ট তত্ব নেই। বিভিন্ন সময়ে মুদ্রাস্ফিতির কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে দুরকমের মুদ্রাস্ফিতি দেখা যায়। একটি তৈরি হয় ক্রেতার চাপে অন্যটি তৈরি হয় উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির ফলে। তারপরও ঠিক কোনটি মুদ্রাস্ফিতির জন্য দায়ী – ভোক্তার চাপ না উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি তা খালি চোখে দেখা যায় না। অর্থনীতিবিদরা তাই ব্যবহার করেন – অর্থনীতির কম্পিউটার-মডেল। তবে এটাও সত্য যে, দাম যখন বাড়ে তখন সবাই দেখতে পায় – খালি চোখেই। তাই মডেল ব্যবহার না করে যে কোন কোন অর্থনীতিবিদ কারণ বিশ্লেষণ করেন না তা নয় – তারা করেন নিতান্ত আন্দাজ করেই। এই আন্দাজকে একেবারে যে বেকুবের আন্দাজ বলা যাবে তা নয়। আন্দাজে যথেষ্ট যুক্তি থাকে কারণ অনেকেই দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ তাই তাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি আর দশজনের চেয়ে বেশী। একে আমরা বলি 'বুদ্ধিদিপ্ত আন্দাজ'। আন্দাজে ঢিল ছুড়লে যা হয় – কোনটা লাগে আর কোনটা লাগে না। তাই এই সব পরামর্শ কখনও কখনও গ্রহণের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

দেশের ভেতরের কিছু বলার আগে – দেখা যাক বিশ্বের কোথায় বর্তমান মুদ্রাস্ফিতি কেমন। আমাদের দেশে যে সকল দেশ সবচেয়ে বেশী পণ্য পাঠায় তার মধ্যে অন্যতম হল চীন ও ভারত। জুলাই মাসে চীনের মুদ্রাস্ফিতি গত ২৭ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছেছে। ফলে চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন যে, চীন সরকার মুদ্রাসংকোচন নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছে। তবে চীনের গভর্নর এটাও বলেছেন যে, উন্নত বিশ্বের মত চীনের মুদ্রাসংকোচন নীতির মানে এই নয় যে সুদের হার বাড়ানো হবে। কারণ চীনে সুদের হারের সাথে বিনিয়োগ চাহিদা ততটা নির্ভর করে না। তারা চেষ্টা করবেন বাজারে মুদ্রার সরবরাহ কমাতে। অনেকে বলছেন যে, চীনে দীর্ঘদিনের উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে এই মুদ্রাস্ফিতি হচ্ছে। তবে তাও কতটুকুন সত্য তা বলা মুশকিল। কেননা, দেখা যাচ্ছে চীনে একবছরে মাংশের দাম বেড়েছে ২৬ শতাংশ আর ডিমের দাম বেড়েছে ৩৭ শতাংশ। তবে একই সময়ে দাম কমেছে শাক-সবজির প্রায় ৩ শতাংশ আর ফলমুলের দাম কমেছে ১১ শতাংশ। বুঝতেই

পারছেন যে, মুদ্রাস্ফিতি মানে সকল পণ্যের দাম বৃদ্ধি নয়। চীনের গড় মুদ্রাস্ফিতির পরিমাণ ৩.১ শতাংশ। এর আগের বছর চীনে মুদ্রাস্ফিতির পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৫ শতাংশ।

চীনের পরই আমাদের প্রধান আমদানিকারক দেশ হল ভারত। আগস্ট ৪, ২০০৭ তারিখ থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর সে দেশে ব্যাংক রেটের পরিমাণ বাড়িয়েছেন ০.৫ শতাংশ। এর ফলে ভারতে সুদের হার গত ৫ বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছুবে। এ ছাড়াও মুদ্রার সরবরাহ সংকোচন করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন চিন্তা করছে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও বৃদ্ধি করার। উদ্দেশ্য? ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফিতি থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করা। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বেধে দেওয়া মুদ্রাস্ফিতির সর্বোচ্চ মান হল ৫ শতাংশ। ১৯৯৯ সালের পর ভারতে মুদ্রাস্ফিতি কখনই ৪.৭ শতাংশের উপর উঠেনি। বর্তমানে তা ৭ শতাংশের একটু উপর। অনেকেই বলছেন যে, ভারতের মুদ্রাস্ফিতির অনেকগুলো কারণে হয়েছে। মুদ্রাস্ফিতি বিশ্লেষণের বাইবেল অনুসরন করে অনেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা সংকোচন নীতির সমালোচনাও করছেন। তারা বলছেন প্রথমত: ভারতের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশের উপর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর ফলে ভোক্তার চাপে মুদ্রাস্ফিতি হতে পারে। দ্বিতীয়ত: সরকার ঘাটতি বাজেট দিচ্ছেন (কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয়ই) ফলে দেশে সার্বিক চাহিদা বাড়ছে (যোগানের তুলনায়)। তৃতীয়ত: মুদ্রাস্ফিতি পরিমাপ করা হয় ভোক্তার মূল্যসূচক থেকে এখানে সরকারের উদার আর্থিক ব্যবস্থাপনা মুদ্রাস্ফিতির কারণ নয়। চতুর্থত দেখা যাচ্ছে যে, খুচরা বাজার ও পাইকারী বাজারে মূল্য সূচক একই হারে বাড়ছে না তাই এই মুদ্রাস্ফিতির কারণ কি আদৌ মুদ্রা নীতি হতে পারে? পঞ্চমত: দীর্ঘদিন পর ভারত গত বছরই বৃহত্তম বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করেছে। ফলে দেশের সার্বিক চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করেছে। তাই সব বিচার করে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রাসংকোচন নীতি মুদ্রাস্ফিতি সংকোচনে আদৌ প্রভাব ফেলতে পারবে না।

দেখা যাক, অন্যান্য দেশের অবস্থা কেমন? শ্রীলংকার মুদ্রাস্ফিতির হার গত বছর ছিল ১৭ শতাংশ। তবে এ বছর তা কমে দাড়িয়েছে ১৩ শতাংশের কাছাকাছি। মালয়েশিয়ার মুদ্রাস্ফিতির হার ৩.৮ শতাংশ। এই হার গত একবছরে বেড়েছে। গত এক বছরের মধ্যে মালয়েশিয়ার সরকার তেলের দাম বাড়িয়েছে ৩ বার। দেখা গেছে এই সময়ের মধ্যে তেল ছাড়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্যই বেড়েছে সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ। অন্যদিকে থাইল্যান্ডে মুদ্রাস্ফিতির পরিমাণ কমেছে প্রায় ১.৭ শতাংশ যা বর্তমানে ১.৯ শতাংশের কাছাকাছি। অনেকে বলছেন, থাইল্যান্ডের অর্থনীতির গত একবছরে স্থবির হয়ে পড়েছে (দূর্নীতি বিরোধী অভিযানের ফলে!) তাই মুদ্রাস্ফিতি কমেছে – সাথে সাথে কমেছে চাকুরীর সুযোগ, কমেছে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হার।

সব তথ্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, মুদ্রাস্ফিতির কারণ খুব স্পষ্ট নয়। বিশ্বের বাজারে মূল্য বাড়ার ফলে মুদ্রাস্ফিতি হলে থাইল্যান্ডে এর হার কমার কথা নয়। তাই আমদানীকারকরাই মুদ্রাস্ফিতি ঘটাচ্ছেন এই তত্ব দেশের অর্থনীতির জন্য বিপদজনক। একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলাদেশেও খুচরা বাজার ও পাইকারী বাজারের মধ্যে মূল্যের ফারাক ক্রমাগত বাড়ছে। অনেকে বলছেন এখানেও সিন্ডিকেট রয়েছে। আমি এই বক্তব্যের সাথেও একমত নই। বরং ভেবে দেখা উচিত কেনা কৃষকরা পণ্য বিক্রী করতে খুচরা বাজারে ছুটে আসছেন না! এর পেছনে রয়েছে আমাদের ব্যর্থতা। গত ১০ বছরে ঢাকা শহরের মানুষের সংখ্যা বেড়েছে – হয়েছে প্রায় দ্বিগুন। কিন্তু বাড়েনি বাজারের সংখ্যা। ফলে গুটিকয়েক খুচরা বাজারের হাতে আমরা হয়ে পড়েছি জিম্মি। একেই অনেকে সিন্ডিকেট বলে মূল সমস্যা যেমন আড়াল করতে চাচ্ছেন আবার তেমনি ব্যবসায়ীদের সন্ত্রস্থ করে দাম বৃদ্ধিতে সহায়তা করছেন। এই অবস্থা বাংলাদেশের ছোট বড় প্রায় সকল শহরের জন্যই সত্য। লক্ষ্য করুন শহরের বাইরে কিন্তু পন্যের দাম কম তাই চাষীরা মাথায় হাত দিচ্ছেন। গত প্রায় ২০ বছর যাবত আমাদের মাননীয় মেয়র/পৌর চেয়ারম্যানরা খুচরা বাজার তৈরি করে প্রতিযোগিতা বাড়াতে চান নি। কি কারণে তারা এই বিষয়ে উদাসীন থাকলেন? কর বাড়ানোর জন্য নাকি চাদা বাড়ানোর জন্য? সহজ ভাষায় বলি– যদি কোন শহরের জনসংখ্যা প্রতি ১০ বছরে দ্বিগুন হয় তবে সেই শহরের খুচরা বাজারের সংখ্যা একই সময়ে ন্যূনপক্ষে দুই গুন হতে হবে। তবেই সৃষ্ঠি হবে প্রতিযোগিতার। তাহলে দেখবেন চাষীরা পাবে উচ্চ মূল্য এবং ক্রেতারা পাবে ন্যায্যমূল্য। আরও একটি কথা – চাষীদের সরাসরি বাজারে প্রবেশাধিকার দেওয়া যায় না কেন? প্রতিটি উন্নত দেশে সাচ্চা কৃষকদের জন্য রয়েছে 'কৃষি মার্কেট' যা সপ্তাহে একদিন বা দুদিন নির্দিষ্ট স্থানে বসে এবং যেখানে কেবল কৃষকরা পণ্য বিক্রয় করতে পারেন। আমাদের দেশে অনেকেই মীনাবাজার করে থাকেন।

এই ব্যবস্থাটাও মীনাবাজারের সমতূল্য। তবে এখানে বিক্রেতারা হবেন প্রকৃত কৃষক। প্রতিটি শহরে এই ধরণের এক বা একাধিক বাজার সৃষ্ঠি করা উচিত। এবং তা এক্ষুনি করা উচিত। একই সাথে কৃষকদের আইডি কার্ড তৈরি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বলতে পারেন –মুদ্রাক্ষিতি সমস্যার সমাধান তাহলে কি সুদূর পরাহত? উত্তর – সহসা হবে না। প্রয়োজন সুদূরপ্রাসরী চিন্তা ও কাজের। এবং ভেবে দেখুন কৃষি উৎপাদন মাত্র ৩/৪ মাসের ব্যাপার। তাই দেরী না করে সরবরাহ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা জরুরী। এক্ষেত্রে সঠিক চাষীকে চিহ্নিত করতে গিয়ে অনেকে দূনীতির গন্ধ পেতে পারেন এবং পাওয়াটা স্বাভাবিক বলেও আমি মনে করি। তবে সরকারের উচিত বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রকৃত দূর্নীতিবাজদেরও শাস্তির ব্যবস্থা রাখা। সর্বোপরি এইটুকুও চিন্তা উচিত – আমাদের অর্থনীতির গতি কমিয়ে মুদ্রাক্ষিতি কমানো কি উচিত হবে?

শেষ করছি একটি বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমাদের দেশ দূনীতিতে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে অনেকদিন যাবত। এই ঘটনাটি একদিনে ঘটেনি। অনেক 'বুদ্ধিমান' লোকের পরিশ্রমের ফসল। আমি তিন রকমের 'বুদ্ধিমান' লোককে এই ঘটনার জন্য কাজ করতে দেখেছি। এক. যারা সরকারী পদে আসীন ছিলেন বছরের পর বছর এবং যারা নানা কারনে এই অঘটন (দূর্নীতি) দেখতেই পাননি। দুই. সেইসব ব্যবসায়ী যারা প্রথম দলের 'আন্তরিক' সহায়তায় (কেন সহায়তা করলেন তা ভেবে দেখুন) বিত্তের পাহাড় গড়েছেন তবে এরা দেশে বিনিয়োগ করেছেন – সৃষ্ঠি করেছেন শত শত লোকের বেচে থাকার জন্য কাজ বা আয়ের পথ। এবং তিন. সেইসব ব্যবসায়ী যারাও প্রথম দলের 'আন্তরিক' সহায়তায় বিত্তের পাহাড় গড়েছেন তবে তা আবারও প্রথম দলের সহায়তায় পাচার করেছেন বিদেশে। আপনি ভেবে বলুন – এই তিন ধরণের দূনীতিবাজদের মধ্যে কাদের বিচার প্রথমে হওয়া উচিত? এই বিচারের যথার্থতার উপরই নির্ভর করবে আমাদের অর্থনীতি কোন পথে যাবে।

[লেখক ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ও ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের সদস্য]